রাজনীতিতে রঙের খেলা

নাজমুন নেসা পিয়ারি, *বার্লিন থেকে*

জার্মানির রাজনীতির আকাশব্যাপী সত্যি সত্যি এখন রঙের খেলা চলেছে। লাল, সবুজ, হলুদ, কমলা, কালো রঙের ছড়াছড়ি চারদিকে।

বর্তমান সরকারের ‘এসপিডি’ অর্থাৎ সামাজিক গণতন্ত্রী দলের রঙ লাল আর ‘গ্রুইন’ অর্থাৎ সবুজ দলের রঙ সবুজ। বিরোধী ‘সিডিইউ’ বা খ্রিষ্টীয় গণতন্ত্রী দলের রঙ কালো, ‘এফডিপি’ দলের রঙ হলুদ। বার্লিনের বিভিন্ন এলাকায় পথের মাঝখানে আইল্যান্ডে, ল্যাম্পপোস্টে নানান রঙের পোস্টারে বিভিন্ন দলের পদপ্রার্থীদের রঙিন ছবি শহরের চেহারা বদলে দিয়েছে। দেশজুড়ে এখন পুরো মাত্রায় চলেছে আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রচার অভিযান। পোস্টারের ছবিতে চ্যান্সেলর পদপ্রার্থী গেরহার্ট শ্রোয়েডার, এঙ্গেলা মেরকেল এবং অন্য সবার মুখেই আশার আলো ধরে রাখার জন্য কম-বেশি হাসির ঝিলিক। এবারের নির্বাচনে কমলা রঙে রঞ্জিত হয়ে নেমেছেন এঙ্গেলা মেরকেল। তার সব পোস্টারেই এই রঙ প্রাধান্য পাচ্ছে। এ রঙ বেশ সজিবতা এনে দিয়েছে। হয়তো খ্রিষ্টীয় গণতন্ত্রী দলের চিরাচরিত কালো রঙের একঘেয়েমি কাটিয়ে কিছুটা আধুনিক হয়ে ওঠার চেষ্টা। এবারের নির্বাচনে তিনি যদি জিততে পারেন তবে তিনিই হবেন জার্মানির রাজনীতির ইতিহাসে প্রথম মহিলা চ্যান্সেলার। একেবারে সাদামাটা ‘বাওয়ার মেডশেন’ অর্থাৎ ‘চাষীর মেয়ে’ বলে পরিচিত এঙ্গেলা মেরকেল সম্প্রতি চেহারা ও পোশাক-আশাকে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা চালিয়েছেন জোরেসোরে। কেউ কেউ মনে করছেন, চেহারায় তারুণ্য আনার জন্য প্লাস্টিক সার্জারির শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি। চুলের ছাঁটকাট বদলেছেন। তাকে লড়তে হচ্ছে চ্যান্সেলর শ্রোয়েডারের বিরুদ্ধে। সামাজিক গণতন্ত্রী দলের ওপর আস্থা হারালেও এখনো জার্মানির ছেলে-বুড়ো সবাই গেরহার্ট শ্রোয়েডারকে দারুণ পছন্দ করে। এখনো এ দেশে প্রায় ৪০% মানুষ তাকে চ্যান্সেলর হিসেবে চায়, সে ক্ষেত্রে মেরকেলকে চায় ৩০%, যদিও চ্যান্সেলর শ্রোয়েডের আস্থা ভোটের ঘোষণা দেয়ার আগে এ পরিসংখ্যান অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল। গত মে মাসে এসপিডি’র শক্ত ঘাঁটি ‘উত্তর রাইন পশ্চিম ফালিয়া’ রাজ্যে তারা যখন বানের জলে ভেসে যাওয়ার মতো হারিয়ে যায় আর উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে খ্রিষ্টীয় গণতন্ত্রী দল তখন দলনেত্রী এঙ্গেলা মেরকেল তার বড় সেকেলে আটপৌরে চেহারা নিয়েই জনপ্রিয়তার পরিসংখ্যান শ্রোয়েডারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। অন্যান্য রাজ্যগুলোতে এমপিডির অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় অনেকটা একনায়কের মতো চ্যান্সেলর শ্রোয়েডার একাই সিদ্ধান্ত নেন আস্থা ভোটের এবং নতুন নির্বাচনের। এর পেছনে নিঃসন্দেহে কয়েকটা কারণ কাজ করেছে। এভাবে একে একে বিভিন্ন রাজ্যে হেরে যাওয়ার যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তার ওপর থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেয়া। আরো এক বছর অপেক্ষা না করে ‘এজেন্ডা ২০১০’ অর্থাৎ শ্রমের বাজার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে দেশের মানুষের সমর্থনের জন্য উদ্যোগ নেয়া। শ্রোয়েডার গোটা ব্যাপারটা তার ইচ্ছেমতো সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। ১ জুলাই সংসদে ‘আস্থা ভোটে’ তার নিজের দলের দুই-তৃতীয়াংশের অনাস্থা ভোট পেয়ে যান। যা নতুন নির্বাচনের পথ সুগম করে দেয়। জার্মানির নীতি অনুসারে তিন সপ্তাহের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট কোয়েলার ২১ জুলাই সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের জন্য তার সম্মতির কথা জানান।

১৯৮২ সালেও একবার সংকট দেখা দিয়েছিল সামাজিক গণতন্ত্রী দলের ভেতর। তৎকালীন চ্যান্সেলর হেলমুট স্মিথ এবং সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী গেওরস লেবার সামাজিক গণতন্ত্রী দলের ভেতরের অতিরিক্ত বাম চিন্তাধারার রাজনীতিবিদদের জন্য সমস্যার সম্মুখীন হন। তারা সে সময় অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি এবং ক্ষেপণাস্ত্র বিষয়ক নীতিতে তাদের সমর্থন পাননি। আর আজ বিশ্বায়নের ফলে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযাগিতার কারণে শ্রোয়েডারকে এমন এক সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যাতে তার দলের ভেতরের সকলের সমর্থন পেতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল। অর্থ মন্ত্রী ক্লেমেন্টসহ চ্যান্সেলর শ্রোয়েডার যে নীতি গ্রহণ করেছেন তার উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জার্মানির অবস্থা জোরদার করা।

জার্মানির বেকার সমস্যা এখন চরমে পৌঁছেছে। এ দেশে বর্তমানে পাঁচ লাখ লোক

বেকার। জনগণের বড় অসন্তোষের কারণ হয়েছে সেটাই। খ্রিষ্টীয় গণতন্ত্রী দলের বিশাল প্ল্যাকার্ডে তাই দেখা যাচ্ছে মোটা অক্ষরে লেখা 'পাঁচ লাখ লোক বেকার। পরিবর্তন দরকার'। রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন কতোটা ঘটাবে সেটা বলা মুশকিল হলেও দেশের মানুষ পরিবর্তনের একটা পথ খুঁজছে। ১৮ সেপ্টেম্বরের নির্বাচন সেই পরিবর্তন ঘটাবে বলে মনে হচ্ছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় চরম বামপন্থি দল 'পিডিএস' এখন ৯%-এর সমর্থন পাচ্ছে সে ক্ষেত্রে আগে এই সংখ্যা ছিল ৪% থেকে ৫% পর্যন্ত। এই দল জার্মানির পশ্চিমাংশের সমর্থন পাচ্ছিল না। কিন্তু এখন তারা পশ্চিমের প্রোটেস্ট্যান্ট ভোটারদের সমর্থন পাচ্ছেন। আরো সমর্থন পাচ্ছেন হতাশ সামাজিক গণতন্ত্রী ও খ্রিষ্টীয় গণতন্ত্রী দলের সমর্থকদের এবং যারা ভোটদান থেকে বিরত থাকতেন তাদের।

নির্বাচনী প্রচার কাছ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। চ্যান্সেলর শ্রোয়েডার একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে বলেন তার কাছে এখন গুরুত্বপূর্ণ 'বিল্ড সাইটুং' এবং গ্লৎসে'। বিল্ড সাইটুং হলো জার্মানির একটি দৈনিক ট্যাবলয়েড পত্রিকা, যার পাঠক সংখ্যা সর্বোচ্চ, প্রায় ৬০ লাখের মতো। এ দেশে চলতি কথায় টেলিভিশনকে বলে 'গ্লৎসে'। বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়শকা ফিশার জনপ্রিয় রাজনীতিবিদদের অন্যতম। তিনি বলেন, 'ইশ ক্যাম্পফে ভি শোয়াইন' অর্থাৎ 'শুয়োরের মতো লড়ে যাচ্ছি'। অক্লান্তভাবে শহরে গ্রামে-গঞ্জে মানুষের কাছে সরাসরি উপস্থিত হয়ে তিনি তার প্রচার কাজ চালাচ্ছেন। নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে শ্রোয়েডারের জুড়ি নেই। তুখোড় বক্তাও তিনি- প্রতিপক্ষকে কথা দিয়ে আক্রমণ করতেও অত্যন্ত পটু। শ্রোয়েডার প্রতিদ্বন্দ্বী মেরকেলের সঙ্গে দুটি টেলিভিশন ডুয়েল তর্ক-বিতর্কে যোগ দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু মেরকেল বাদ সাধেন, একটার বেশি এ রকম অনুষ্ঠানে অংশ নিতে তিনি রাজি নন।

নির্বাচনের এক মাস আগে এবারেও গতবারের নির্বাচনের সময়ের মতো শ্রোয়েডারের চুলের রঙ নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হয়। ৬১ বছর বয়সেও পরিপাটি করে আঁচড়ানো কুচকুচে কালো চুল তার। গতবার শ্রোয়েডার চুলে কলপ দেন কি না এ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকা হট্টগোল বাধালো বার্লিনের নামকরা সেলুনের মালিক ও কেশ বিন্যাসকারী উডো ভালৎস সমস্যার সমাধান করেন তার মতামত জানিয়ে। একইসঙ্গে শ্রোয়েডারের স্ত্রী ডোরিস শ্রোয়েডার কপফও জানান শ্রোয়েডারের চুলের রঙ স্বাভাবিক, তিনি চুলে রঙ করেন না। শ্রোয়েডারের চুলের রঙ নিয়ে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের ফলে উডো ভালৎস তখন বেশ পরিচিত হয়ে ওঠেন। বলা যায় তারকাদের মতোই এখন তার উপস্থিতি সর্বত্র। এবারও উডো ভালৎস পত্র পত্রিকায় মন্তব্য করেন, 'শ্রোয়েডারের চুল দু'একটা ধূসর হলেও হতে পারে, তবে তার বয়স অনুপাতে সেটা কিছুই না'। উল্লেখ্য, উডো ভালৎস এখন বিরোধী দলনেত্রী এঙ্গেলা মেরকেলের কেশ বিন্যাস করছেন মনের মতো করে। যদিও কোনো এক সাংবাদিক লিখেছেন, 'কৃষকের ঘরের মেয়ের মতো তার রয়েছে গোলাকৃতির মুখ আর খড়ের রঙের চুল। তাঁর এই স্বাভাবিক চেহারাই তাকে মহান করে তোলার জন্য যথেষ্ট'। এঙ্গেলা মেরকেল যাকে সংক্ষেপে মিষ্টি করে বলা হয় 'এনজি'- সেই এনজি পোল্যান্ডের সীমান্তে সাবেক পূর্ব জার্মানির অর্থাৎ বর্তমান জার্মানির উত্তর-পূর্বাংশের 'উকারমার্ক' নামে ছোট একটি জায়গার মানুষ। সেখানে বেকারের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। জার্মানির একটি দরিদ্র এলাকা। মেরকেলের বাবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে রুমানিয়ায় মারা যান। মা মানুষের বাসায় কাজ করতেন। জীবনের কঠিন পথ বেয়ে অনেকখানি উঠে এসেছেন মেরকেল। আশা করা যায়, বাকিটাও উতরে যাবেন।